সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন ঃ পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট

মুহম্মদ শামসউল হক*

পৃথক একটি জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসাবে সমাজ বিজ্ঞান তুলনামূলকভাবে নবীন। সমাজবিজ্ঞানের পরিমন্ডল ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করে গঠিত। জ্ঞান ও গবেষণার অগ্রগতির ফলে সমাজবিজ্ঞান বহু শাখা ও উপশাখায় ব্যাপৃত। এদের মধ্যে প্রধান হলো *সমাজতত্ত্ব* (সোসিওলজি), *সমাজসেবা* ও *সমাজকল্যাণ* (সোস্যাল ওয়ার্ক ও সোস্যাল ওয়েলফেয়ার), *নৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আইন, জনসংখ্যাতত্ত্ব* ইত্যাদি। এই শাখাগুলির প্রকৃত সংখ্যা এবং নামকরণ স্বভাবতই গবেষণালব্ধ বিশেষ জ্ঞানের প্রসারের উপর নির্ভরশীল। এ প্রসংগে এটা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, অধ্যয়ন ও গবেষণার সুবিধার জন্য এই বিভাগগুলি পৃথক করা হলেও, এরা এমনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং একে অপরের পরিপূরক যে, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের উপর এদের প্রভাব সামগ্রিক এবং অবিচ্ছেদ্য। সম্প্রতিকালে এসব ক্ষেত্রে গবেষণার যথেষ্ট উন্নয়ন ও অগ্রগতি হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমানভাবে বিশ্লেষণ ও পরিমাপ উন্নততর ও তীক্ষ্ণতর হয়েছে।

বিগত দু' শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভুতপূর্ব অগ্রগতির ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যতটা সমৃদ্ধ হয়েছে সেই তুলনায় মানুষের মন, মানসিকতা ও সমাজ জীবন সম্পর্কে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বিরাজমান অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব, মূল্যস্ফীতি এবং সামাজিক ও নৈতিক সমস্যা তার একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত এবং সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণাকে আরও শক্তিশালী করা যে অপরিহার্য তারও একটি জোরালো প্রমাণ। উন্নয়নশীল দেশগুলির জটিলতর সমস্যার প্রেক্ষাপটে এরূপ গবেষণার ভূমিকা নিঃসন্দেহে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক যুগে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে আপামর জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে অনেক দেশ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে।

---

*জাতীয় অধ্যাপক এবং প্রাক্তন উপাচার্য ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

এই দৃষ্টান্ত স্বভাবতই অতীতে শোষিত ও বঞ্চিত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এক নতুন ভবিষ্যতের আশা ও আকাঙ্খায় উজ্জীবিত করে। যাঁরা এই উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব প্রদান করেন, তাঁদের অধিকাংশই নিঃসন্দেহে জনগণের কল্যাণে দেশে দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবেদিত ছিলেন। কয়েকটি দেশে এ প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার পথে দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিকদের একটি লক্ষ্য সর্বাপেক্ষা উদ্বেলিত করেছে। তাহলো, যে জাতীয় আশা আকাংখা স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার সফল বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে জনসাধারণের জন্য এক সুন্দর, উন্নত ও পরিপূর্ণ জীবন সুনিশ্চিত করা। এই লক্ষ্য অর্জনের পথ কত দুরূহ ও কনটকাকীর্ণ, স্বাধীনতা উত্তর বিগত বিশ বৎসরের ইতিহাস হতে তা' সুস্পষ্ট। জ্ঞানান্বেষণ, জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে সমষ্টিগত জ্ঞানলাভ দেশ ও জাতিকে দিন–নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

একটি উন্নয়নমুখী বিবর্তনশীল সমাজের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলিও যেমন বহুমুখী, তেমনি জটিল। এসকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পথে একটি প্রধান অন্তরায় আদর্শগত ও মানসিক সংঘাত এবং পরস্পর বিরোধী মনোভাব ও মূল্যবোধ। ক্ষয়িষ্ণু আচার ও প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনের জন্য সোচ্চার দাবীর পাশাপাশি সংস্কার বিরোধী কঠোর আন্দোলন। প্রকাশ্যে দুর্নীতি ও সমাজবিরোধী কর্মের নিন্দা, কার্যত নিজের স্বার্থে ঐ নিন্দনীয় কাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন। গণতান্ত্রিক সমাজ–জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের পাশাপাশি পরিলক্ষিত হয় মুক্তমনের অভাব, পরমতে অসহিষ্ণুতা এবং জাতীয় স্বার্থের উপর ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের প্রাধান্য। কাজেই উন্নয়নে রাজনীতির গভীর প্রভাব সুস্পষ্ট।

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক মেরুকরণের ফলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, জাতীয় সংহতি ও নিরাপত্তা এক বিরাট হুমকির সম্মুখীন। দলমত নির্বিশেষে অনেকেই আশংকা প্রকাশ করছেন যে দারিদ্র জর্জরিত এবং সন্ত্রাস কবলিত জাতি এক চরম সংঘাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। এই সংকট উত্তরণে একমাত্র গণতান্ত্রিক ও শান্তির পথ পারস্পারিক সমঝোতা। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলের নেতৃবর্গ এই শান্তি ও সমঝোতার পথে তাঁদের অভিন্ন লক্ষ্য, গণতন্ত্র সুদৃঢ় করার জন্য সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হবেন এবং জাতীয় ঐক্য অক্ষুন্ন রাখবেন, নিঃসন্দেহে এ সকলেরই কাম্য।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণ পৃথিবীর এই অষ্টম বৃহত্তম দেশটিকে তার যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যে আদর্শদীপ্ত মহান ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তা' যেমন বিশ্বের সকল স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রশংসা অর্জন করে, তেমনি জাতির অগ্রগতির পথে প্রেরণার এক চিরন্তন উৎস সঞ্চারিত করে। জাতিত্বে, ভাষায়, ধর্মে

ও সংস্কৃতিতে বিরাজমান সম প্রকৃতিও বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যের এক বিরল বৈশিষ্ট। জাতীয় সংহতির এই গৌরবময় ঐতিহাসিক ও সামাজিক উত্তরাধিকারের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ কেন বার বার রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে, এ একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানে সমৃদ্ধ পন্ডিতবর্গের সমবেত গবেষণার মাধ্যমেই এর উপর প্রয়োজনীয় আলোক সম্পাত সম্ভব। যে মানসিকতা এ হুমকির মুলে, তার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ জাতীয় সংহতি এবং গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। তবে, কয়েকটি কারণ সুস্পষ্টঃ

প্রথমত ঃ জাতীয় আদর্শবিচ্যুত, অবান্তর ও ভ্রান্তিকর উন্নয়ন পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে সমাজ জীবনে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দারিদ্রজর্জরিত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্থনৈতিক উন্নতি ও উৎপাদন প্রবৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান স্বাভাবিক। উন্নয়ন আন্দোলনের প্রথম দুই দশকে শিল্পায়িত দেশগুলোর সমৃদ্ধি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এত গভীরভাবে চমকিত করে যে সমতুল্য শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নতি তাদের প্রধান ও চরম লক্ষ্য হয়ে পড়ে। উন্নয়ন ও শিল্পায়ন বস্তুত সমার্থ জাতীয় লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কলাকৌশলে একটি আধুনিক পুঁজিপ্রধান উৎপাদন–কাঠামো নির্মাণ অগ্রাধিকার লাভ করে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকাংশই ছিল পুঁজি সম্পদে দরিদ্র এবং মানব সম্পদে সমৃদ্ধ। এমতাবস্থায় পুঁজিসমৃদ্ধ দেশগুলো হতে পুঁজি ধার করে তাদের সমতুল্য শিল্প গড়ে তোলা কতটা বাস্তব, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি যথেষ্ট সতর্কতার সংগে বিবেচিত হয়েছে বলে মনে হয় না। উন্নয়ন আন্দোলনের প্রথমদিকে উচ্চাকাঙ্খার আগ্রহে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভংগি কিছুটা আচ্ছন্ন হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়। তবে যুদ্ধোত্তর ইউরোপ ও জাপানের পুনর্নিমাণে যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়, তার মূল কারণ একমাত্র মার্কিন পুঁজি নয়, বরং প্রধান হাতিয়ার ছিল ঐ সকল দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষজনশক্তি। কিন্তু উন্নয়নে শিক্ষিত মানব সম্পদের ভূমিকা অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার পায়নি।

দ্বিতীয়ত ঃ উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মূল্যবান ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে, এটাও রুঢ় সত্য যে, শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অর্জনের প্রবেশ দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত নয়। শিল্পায়িত দেশগুলোতে জাতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হস্তান্তরে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রসংগে এও স্মরণ রাখতে হবে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্বস্তুক নয়। এর আবিষ্কার ও ব্যবহার শিল্পায়িত দেশগুলোর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য যে দৃষ্টিভংগি, কর্মকুশলতা, জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা প্রয়োজন এবং সেজন্য যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ অপরিহার্য, তা উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে সমতুল্য ফল প্রত্যাশা করা সম্পূর্ণ অবাস্তব। একই কারণে কলাকৌশল এক সামাজিক পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে ব্যবহারের প্রচেষ্টার ফলাফল কেবল যে নৈরাশ্যব্যঞ্জক হয়েছে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে নতুন সমস্যা ও সংকট, গভীরতর করেছে আঞ্চলিক ও

শ্রেণীবৈষম্য। সম্পদ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে আরোপিত কঠিন এবং অনেক ক্ষেত্রে অবান্তর শর্তগুলি পরিস্থিতিকে আরো জটিলতর ও কঠিনতর করে। পুঁজি নির্ভর সীমিত শিল্পায়ন এবং ন্যায়বিচারভিত্তিক সামাজিক কল্যাণ এই দুই লক্ষ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সমাজ-জীবনকে বিকৃত ও বিপন্ন করে তোলে। এমনকি কোথাও কোথাও, যেমন বাংলাদেশে (স্বাধীনতাপূর্বকালের পাকিস্তানে), বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা উত্তরকালেও শিক্ষা ও উন্নয়নের বিচ্ছিন্ন ও সামঞ্জস্যহীন প্রচেষ্টা যে ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি করে, তার এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সম্মিলিত প্রভাব জাতীয় অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয়ত : সমাজ ও সংস্কৃতির সংগে উন্নয়ন ও শিক্ষার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের সম্যক উপলব্ধির অভাব, উন্নয়ন ও শিক্ষার ভূমিকার অপব্যাখ্যা এবং প্রতিকূল বিশ্বপরিস্থিতির অশুভ প্রভাব গত চার দশকে কেবল বাংলাদেশে নয়, সমগ্র উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের জন্যে সৃষ্টি করেছে এক জটিল ও উদ্বেগজনক সংকট। মানুষের উন্নয়নের সংগে শিক্ষার যেমন নিবিড় ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ তেমনি প্রতিবেশের সংগে উভয়ের পাস্পরিক সম্বন্ধ একদিকে সমাজকে প্রভাবিত করেছে এবং অপরদিকে সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এই ত্রিমুখী প্রক্রিয়া মানব সমাজে আদিম যুগ হতে সংস্কৃতি ও সভ্যতার গতিশীল ও সৃষ্টিমুখী ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। জাতীয় উন্নয়নে মানব সম্পদের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধির জন্যে ইতিহাসের আলোকে এই ত্রিমুখী অর্থাৎ শিক্ষা, সমাজ ও সভ্যতার পারস্পরিক সম্বন্ধের বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা অপরিহার্য।

চতুর্থত : ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি। প্রায় চার দশক পর্যন্ত বিশ্বের দুই পরাশক্তির মধ্যে বিরাজমান আদর্শগত মতাবিরোধ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রূপান্তরিত এবং এদের পারস্পরিক সম্বন্ধে মেরুকরণ প্রক্রিয়াও ক্রমেই প্রসারিত ও গভীরতর হতে লাগল। এর একটি অবশ্যম্ভাবী ফল হলো সমরাস্ত্র প্রতিযোগিতা। পারমাণবিক মারণাস্ত্রের যুগে এরূপ অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিশ্বশান্তির জন্যে যেমন ভয়াবহ হুমকি, তেমনি সমরাস্ত্রের জন্যে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের ফলে বিশ্ব অর্থনীতি হলো সংকটাপন্ন। সমরাস্ত্রের জন্যে ব্যয় ১৯৭০ সনে ৩০০ বিলিয়ন ডলার থেকে দ্রুত বেড়ে ১৯৮০ এর দশকে ১০০০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে।

পঞ্চমত : বিশ্বসম্পদের এই বিরাট অপচয়-এর সংগে সংগে ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা এবং ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও সংকটময় ও জটিলতর করে তোলে। এর প্রতিকূল ও সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ধনী দরিদ্র সকল দেশেই প্রতিফলিত হয়। তবে দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশি। একদিকে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক সাহায্য-সংকোচন যেমন তাদের উন্নয়ন আন্দোলনকে ব্যাহত করে, অপরদিকে শিল্পায়িত দেশগুলো হতে আমদানিকৃত দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান মূল্য এবং নিজেদের রপ্তানিকৃত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। ফলে উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগের জন্য তাদের সীমিত

সম্পদ ভান্ডার আরও সীমিত হয়ে পড়ে। অনিবার্যভাবে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই উন্নয়নের প্রবৃদ্ধির হারে অধোগতি এবং বিশ্বের শিল্পায়িত ও উন্নয়নশীল দেশেগুলোর মধ্যে আয়ের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য দেখা দেয়। এ বৈষম্য বিগত তিন দশকে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ১৯৬০ সনে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী ২০% জন সংখ্যার আয় দরিদ্রতম ২০% ভাগের আয়ের ৩০ গুণ ছিল। কিন্তু ১৯৯০ দশকের প্রারম্ভে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী ২০% ভাগের আয় ছিল ৬০ গুণ বেশী। দেশের অভ্যন্তরীণ আয়গত বৈষম্য ধরলে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ধনী ২০% এর আয় দরিদ্রতম ২০% এর চেয়ে ১৫০ গুণ বেশি।

বিগত দু'বছরে কতগুলি যুগান্তকারী ঘটনা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জোয়ার সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করে। পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি ঘটে। পরাশক্তি পর্যায়ে শীতল যুদ্ধ এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান হয়। পূর্ব ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়ায় জাতিভিত্তিক কতগুলি স্বাধীন ও স্বার্বভৌম রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদের অবসান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়। অবশ্য এটা মনে করা ঠিক হবে না যে বর্তমান বিশ্ব এখন সশস্ত্র বিরোধ মুক্ত। বরং ক্ষুদ্রাকারে এরূপ বিরোধ–এর সংখ্যা ও সম্ভাবনা বেড়েছে। তবে মানবিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের ভিত্তিতে যে পরিবর্তন ধারা সূচিত হয়েছে, তার প্রভাব সুদুর প্রসারী।

রাষ্টীয় নিরাপত্তা, জাতীয় উন্নয়ন, ভুমন্ডলীয় পরিবেশগত ভারসাম্য সংরক্ষণসহ আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোগত চিত্রে চিন্তাবাবনায় একটা মৌলিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। *প্রথমত*, জাতীয় নিরাপত্তা এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কে অর্থনৈতিক শক্তির ক্রমবর্ধমান প্রভাব সুস্পষ্ট। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি হতে দেখা যায় যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অবিভাজ্য। অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে উপেক্ষা করে সামরিক শক্তিবৃদ্ধি রাষ্টীয় নিরাপত্তার জন্য সহায়ক না হয়ে ক্ষতিকর হয়ে থাকে। অপরদিকে জাপানসহ অন্যান্য যে সকল রাষ্ট্র অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সাফল্য অর্জন করেছে, তাদের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি তাদের সৃজনশীল সুদক্ষ মানব সম্পদ এবং জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর উন্নয়ন কৌশল। উন্নয়ন ধারাকে ত্বরান্বিত করার জন্যই মানব সম্পদ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এশীয় অঞ্চলে উন্নয়নে অগ্রগামী দেশগুলি যেমন, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, তাইওয়ান, সিংগাপুর, মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা এরূপ উন্নয়ন কৌশল সমর্থন করে।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং মুক্তবাজার উন্নয়নের গতিশীলতার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। অবশ্য এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে মুক্ত বাজার উন্নয়নশীল দেশগুলির দ্রুত উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে, যদি বিশ্ববাজারে প্রবেশের সমান অধিকার ও সুযোগ উন্নয়নশীল দেশগুলি পায়। বর্তমানে বিশ্ববাজার বিভিন্নভাবে শিল্পোন্নত দেশগুলি কর্তৃক তাদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত। যেমন, যে সকল উৎপাদন ক্ষেত্র

শ্রম–নিবিড় এবং কাজেই উন্নয়ন দেশগুলির অনুকূলে, সেখানে প্রভাবশালী শিল্পোন্নত দেশগুলিকে তাদের অনুকূলে বাজারনীতি পরিবর্তন করতে দেখা যায়। বিশ্ববাজারসহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গণতন্ত্রায়ন– এর উপর এ সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে।

তৃতীয়ত, ধনী দেশগুলিতে সামরিক ব্যয় হ্রাসের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য ধনী দেশগুলি হতে সম্পদ প্রবাহ তুলনাকৃতভাবে বৃদ্ধি পাবে এরূপ ধারণা করা বোধ হয় ঠিক হবে না। বিগত দশকে বহিঃসম্পদ প্রবাহ ধারা হতে দেখা যায় যে একদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলির বিদেশী ঋণের ভার এক ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। এজন্য বছরে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে প্রায় দু'শত বিলিয়ন ডলার ধনী দাতাদেশগুলিকে দিতে হচ্ছে। অপরদিকে বিদেশী অর্থ–সাহায্য ক্রমে ক্রমে সংকুচিত হয়ে ১৯৮১ সনে ৪২৬ বিলিয়ন ডলারে হ্রাস পায়। এবং দাতাদেশ/ সংস্থাগুলি কর্তৃক আরোপিত ঋণের শর্তগুলি কঠিনতর হতে থাকে। ১৯৮৮ সনে এ সম্পদ প্রবাহ বিপরীত মুখী হয় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলি হতে ৩২·৫ বিলিয়ন ডলার ধনী দেশগুলিতে হস্তান্তরিত হয়।

সাম্প্রতিককালে বিশ্বচিত্রে যে পরিবর্তন ধারা সূচিত হয়েছে, তা এখনও চলমান। তাই এর সঠিক মূল্যায়ন করা কঠিন। তবে, তার সামগ্রিক প্রভাব আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে বলে আশা করা যায়। যথাঃ

(১) পরিবেশ দূষণ বর্তমানে এমন এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে যে তা সমগ্র বিশ্বের জন্য এক হুমকি হিসাবে চিহ্নিত। কিছুদিন পূর্বে ব্রাজিলে পরিবেশ সম্পর্কে যে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে ধনী দরিদ্র সকল রাষ্ট্রই এই হুমকির ভয়াবহতা স্বীকার করেন। এ বিষয়েও সকলে একমত হন যে, এ হুমকির প্রতিকার ধনী দরিদ্র সকল রাষ্ট্রের আন্তরিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। অবশ্য এ সহযোগিতার বাস্তব রূপায়ন কিভাবে হবে সে সম্পর্কে মতের বিভিন্নতা রয়েছে। তবে ধনী দরিদ্র সকল রাষ্ট্র তথা সমগ্র বিশ্বের পরিবেশগত নিরাপত্তা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল, তা' সর্বজনস্বীকৃত।

(২) সামগ্রিকভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠির ক্রম–সম্প্রসারণ পরিবেশ দূষণের সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত, এ অভিমত ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি লাভ করছে। বিগত চার দশকে উন্নয়ন প্রচেষ্টা দারিদ্র মোচনে ব্যর্থ হয়েছে এটা সুপ্রমাণিত। মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রতিবেশ সংরক্ষণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দারিদ্র বিমোচনে কলা–কৌশল নির্মাণ প্রয়োজন। এজন্য দারিদ্রকে একটা বিশ্ব সমস্যা হিসাবে দেখতে হবে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বপর্যায়ে সুসমন্বিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

(৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বিশেষ করে, যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে বিরাট এবং অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে, তার গতিশীলতা অব্যাহত রাখা কোন একটি রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা দ্বারা সম্ভব নয়। এজন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য।

বিগত চারদশকে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সকল ধ্যান–ধারণায় বিভিন্ন ঘটনাবলী জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে তার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ হতে এটা সুস্পষ্ট যে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়া একটি অতি জটিল বিষয়। এজন্য বিজ্ঞ নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক প্রেরণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে এই প্রেরণাকে কাঙ্খিত রূপ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিঃসন্দেহে সমাজের বিভিন্ন অংশকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে জাতীয় আশা–আকাঙ্খার সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এবং তার ভিত্তিতে জাতীয় উন্নয়নে প্রধান সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে তাদের সমাধানের জন্য সঠিক ও কার্যকর দিক নির্দেশনায় সমাজবিজ্ঞানীদের অবদান অপরিহার্য। এই দায়িত্ব পালনে তাঁদের অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে, সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রধান লক্ষ্য ও উৎস মানুষ ও তার উন্নয়ন প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কৌশল হলো মানুষের সৃজনশীল বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশের। বাংলাদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত এবং অধিকতর ফলপ্রসু করার জন্য, সমাজ বিজ্ঞান গবেষণার লক্ষ্য, পদ্ধতি এবং পরিচালনা সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইঃ

(১) প্রথমত, সামগ্রিক এবং সমন্বিতভাবে জাতীয় মৌল সমস্যাগুলি সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার জন্য যে জাতীয় সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ রয়েছে, তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হলে এ পরিষদকে স্বশাসিত ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলা প্রয়োজন হবে এবং সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যাঁরা কর্মরত তাঁদের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব এই পরিষদে থাকতে হবে। যাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আছেন, তাঁদের সংগে পরামর্শক্রমে সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারযোগ্য মৌল জাতীয় সমস্যাগুলি এ পরিষদ চিহ্নিত করবেন এবং সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(২) গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য ছাড়াও ফলপ্রসু এবং উৎকৃষ্টমানের গবেষণার ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হন, যথোপযুক্ত পেশাগত এবং জাতীয় স্বীকৃতি যেন তাঁরা পান,

সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, অতীতে অনেক সমাজবিজ্ঞানী এমন অনেক গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করেছেন, যার গুরুত্ব বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যাগুলির প্রেক্ষাপটে খুবই নগণ্য, কিন্তু এরূপ নির্বাচনের প্রধান কারণ ও প্রেরণা হল এই গবেষণার মাধ্যমে দেশের বাইরে পেশাগত স্বীকৃতি লাভের সম্ভাবনা।

(৩) কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সমাজবিজ্ঞানী দেশের মৌল সমস্যাকে এড়িয়ে গবেষণার জন্য এমন সমস্যা বেছে নিয়েছেন, যেখানে বিদেশেলব্ধ বিশ্লেষণ ও পরিমাপ পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব। দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের যে বিপুল মানব সম্পদ, যার অধিকাংশ পল্লী অঞ্চলে, তাদের উৎপাদনমুখী ব্যবহার এমন এক মৌল সমস্যা, যার সম্মুখীন শিল্পায়িত দেশগুলির হতে হয়নি। এ সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য বাংলাদেশেরই সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির বিশেষ পেক্ষাপটে সমাজবিজ্ঞানীকে যথোপযোগী নিজস্ব গবেষণা পদ্ধতির উদ্ভাবনে সক্রিয় হতে হবে। এর ফলে সমাজবিজ্ঞানে যাঁরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন এবং যাঁরা বর্তমানে বিদেশী সমাজভিত্তিক সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, তাঁরাও এ গবেষণার অবদান থেকে লাভবান হবেন এবং ভবিষ্যতে গবেষণার কাজও সহজতর হবে। কাজেই সমাজ বিজ্ঞানে এজন্য বাংলাদেশের সামাজিক পরিবেশ উপযোগী কার্যকর গবেষণা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি উদ্ভবাবন এবং প্রয়োগে জাতীয় সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সাহায্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৪) এ প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, জাতীয় সমস্যাকে গবেষণায় অগ্রাধিকার প্রদানের অর্থ এই নয় যে, আমাদের দেশের সমাজ বিজ্ঞানীগণ অন্যান্য দেশে পরিচালিত গবেষণাকর্ম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবেন। পরন্তু গবেষণার সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্য অন্যান্য দেশের সমাজবিজ্ঞানীদের সংগে অভিজ্ঞতা আদান প্রদানের পূর্ণ সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় হবে। একই কারণে জাতীয় সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদকে অনুরূপ গবেষণার দায়িত্বে নিয়োজিত বিদেশী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সংগে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতে হবে।

(৫) বাংলাদেশের মৌল জাতীয় সমস্যাগুলির সঠিক ও সুষ্ঠু বিশ্লেষণের জন্য সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা একান্ত আবশ্যক।

এসকল মৌল সমস্যার কার্যকর উপায় উদ্ভাবনে যেখানে প্রয়োজন সমাজবিজ্ঞানীদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার বিশেষজ্ঞদের সংগেও সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৬) চিহ্নিত সামাজিক মৌল সমস্যাগুলির সমাধানের প্রচেষ্টার সাথে সাথে গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে জাতীয় উননয়নে অগ্রগতির মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ গতিধারা (প্রোজেকশন) সম্পর্কে সরকার এবং দেশকে অবহিত করাও সমাজবিজ্ঞানী এবং জাতীয় সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের একটি অন্যতম দায়িত্ব হবে।

(৭) অতীতে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে বাংলাদেশে যেসব গবেষণা পরিচালিত হয়েছে, তাতে গবেষকদের তাত্ত্বিক গবেষণার প্রতি বিশেষ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তাত্ত্বিক গবেষণার মূল্য অনস্বীকার্য; কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন সমাস্যার পটভূমিতে সঠিক দিক নির্দেশনা এবং কার্যকর কর্মপন্থা উদ্ভাবনের জন্য প্রায়োগিক গবেষণার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই ভবিষ্যৎ গবেষণা কার্যক্রমে সমাজবিজ্ঞানীদের প্রায়োগিক গবেষণার প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর এবং সক্রিয় দৃষ্টি দিতে হবে।

(৮) উচ্চতর শিক্ষাস্তরে শিক্ষা এবং গবেষণা কর্মকান্ড পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। উন্নত দেশগুলির উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের নিরিখে দেখলে এটা সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণা কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা একান্ত প্রয়োজন এবং সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে গবেষণাকে বাস্তবমুখী করতে হবে। এর ফলে মানের দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানের যেমন উৎকর্ষ সাধিত হবে, জাতীয় উন্নয়ন সমস্যা সমাধানেও এ শিক্ষা অধিকতর কার্যকর এবং অর্থবহ হবে।

(৯) অনেক বিদেশী গবেষক এবং পরামর্শদাতা (কনসালটেন্টস) বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সংগে সংযুক্ত থেকে, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবেও বিভিন্ন ধরনের গবেষণাকর্মে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা সমাজবিজ্ঞানী, তাঁদের সংগে নির্ধারিত সংখ্যায় বাংলাদেশী সমাজবিজ্ঞানীদের কাজ করার সুযোগ এবং তাঁদের সংগৃহীত তথ্য জাতীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের তথ্যকেন্দ্রে জমা

দেয়ার ব্যবস্থা করণ সমাজবিজ্ঞান গবেষণার উন্নয়নে একটি বাঞ্ছিত পদক্ষেপ।

(১০) যে কোন ক্ষেত্রে গবেষণাকর্ম একটি গতিশীল প্রক্রিয়া এবং এর মূল্যায়নের একটি মাপকাঠি হল গবেষণাপ্রসূত ফলফল সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের (ইউজারস) মতামত। এই উদ্দেশ্যে গবেষক এবং ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র এবং অভিজ্ঞতা ও মত বিনিময়ের প্রযোজনীয় সুযোগ থাকতে হবে। বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণাকে একটি গবেষক এবং ব্যবহারকারী সমন্বয়ে "গবেষণা কেন্দ্রজালের" (রিসার্চ নেটওয়ার্ক) সক্রিয় রূপদান বাঞ্ছনীয়।